ইউনিট ১১
অনুচ্ছেদ লিখন

উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ে আপনি–

- অনুচ্ছেদ কী তা শিখতে পারবেন।
- অল্পকথায় কোনো বিষয় সম্পর্কে মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারবেন।
- বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করার কৌশল শিখতে পারবেন।
- বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা-অপ্রাসঙ্গিকতার বিষয়ে সচেতন হবেন।

অনুচ্ছেদ কাকে বলে

প্রবন্ধ বা রচনার সংক্ষিপ্ত রূপই অনুচ্ছেদ। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে অল্প কিছু বাক্যের মধ্যে প্রকাশ করাকে অনুচ্ছেদ বলে। অনুচ্ছেদ আকৃতি ও প্রকৃতিতে ছোট হলেও এর কাঠামোর মধ্যে তিনটি ভাগ অঘোষিতভাবে রয়েই যায়। এগুলো হলো– সূচনা, মূল বক্তব্য ও সমাপ্তি। এই তিনটি বিষয় রচনা বা প্রবন্ধে দেখা গেলেও অনুচ্ছেদ লেখার সময় এই তিনটি বিভাজন মাথার মধ্যে রাখতে হয়। ইংরেজি Paragraph এর সমার্থক হলো বাংলা অনুচ্ছেদ।

অনুচ্ছেদের বৈশিষ্ট্য

১. অনুচ্ছেদ একটিমাত্র প্যারা বা স্তবকে সীমাবদ্ধ থাকে।
২. অনুচ্ছেদের প্রতিটি বাক্য গুরুত্বপূর্ণ।
৩. অনুচ্ছেদের প্রতিটি বাক্য পরস্পর সম্পর্কিত থাকে।

গণতন্ত্র

গ্রিক শব্দ Demosও Kratiaথেকেঃ Democracyশব্দটি এসেছে। যার অর্থ হলো গণতন্ত্র। গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের শাসন। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত শাসন প্রক্রিয়াই হলো গণতন্ত্র। গণতন্ত্রে জনগণই হলো সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এখানে কোনো প্রকার স্বৈরাচরের স্থান নেই। জনগণের চূড়ান্ত ইচ্ছাতেই পরিচালিত হয় রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম। গণতন্ত্র সম্পর্কে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন তাঁর গেটিসবার্গ ভাষণে বলেছিলেন, 'গণতন্ত্র হলো জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা গঠিত সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার।' গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। কেননা, জনগণ যদি মনে করে ওই প্রতিনিধি তাদের পক্ষে কাজ করছে না, তখন জনগণ নিজেরাই ওই ব্যক্তিকে পরবর্তীতে নির্বাচিত করবে না। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য একটি উত্তম ব্যবস্থা হিসেবে মনে করেন। একারণে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে গণতন্ত্রের চূড়ান্ত উত্থান লক্ষ করা যায়। এই গণতন্ত্রের জন্য, গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য আমরা ১৯৭১ সালে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছি। এর ফল এখন আমরা ভোগ করছি। এই ধারা অব্যাহত থাকুক। এদেশে গণতন্ত্রের শতদল ফুটে উঠুক।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা

কোনো দেশের জনসংখ্যা সে দেশের জন্য আশীর্বাদ। কিন্তু তা অভিশাপে পরিণত হয় যখন তা ওই জাতি বা রাষ্ট্রের জন্য বোঝা হিসেবে দেখা দেয়। যখন একটি রাষ্ট্র ওই দেশের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়, তখন ওই দেশের জনগণ অভিশাপ হিসেবে দেখা দেয়। বাংলাদেশের জন্য এর জনসংখ্যা প্রায় অভিশাপ হিসেবে দেখা দিয়েছে। কেননা বাংলাদেশের সম্পদ সীমিত। দেশের আয়তনের তুলনায় ব্যাপক জনসংখ্যা। যাকে তাত্ত্বিকেরা বলছেন জনসংখ্যার বিস্ফোরণ। অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে জনগণ বঞ্চিত হচ্ছে যথাযথ শিক্ষা থেকে। মৌলিক চাহিদা পূরণ করাই হয়ে পড়েছে বিলাসিতার মতো। ফলে অধিক জনসংখ্যা পতিত হচ্ছে ব্যাপক বেকারত্বে, অশিক্ষায়, অস্বাস্থ্যে। অত্যধিক মানুষের চাপে নষ্ট হচ্ছে পরিবেশের

ভারসাম্য। অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হওয়ায় জীবনযাত্রার মান ও মাথাপিছু আয় অনেক কমে গেছে। কেননা যে বিশাল জনসমুদ্র রয়েছে তাদের মানব সম্পদে পরিণত করা সর্বাংশে সম্ভব হচ্ছে না। এত দিনদিন দুর্দশা বেড়েই চলেছে। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূলে রয়েছে, দারিদ্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার, অসচেতনতা ইত্যাদি সমস্যা। তবে এই অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে সরকার থেকে শুরু করে দেশের প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো। রেডিও, টেলিভিশন, সামাজিক মাধ্যম এবং পত্রপত্রিকায় চালাতে হবে সামাজিক আন্দোলন। তবেই আমরা এই অভিশাপ তেকে মুক্তি পাব।

শিশুশ্রম

আজকের শিশু আগমী দিনের ভবিষ্যৎ। কেননা প্রতিটি শিশুর মধ্যে লুকিয়ে আছে আগামী দিনের অমিত সম্ভবনা। সেজন্য শিশুকে গড়ে তোলা উচিত যোগ্য নাগরিক হিসেবে। তা না হলে এ জাতি হারাবে তার ভবিষ্যতের দিশা। কিন্তু শিশুকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার পথে রয়েছে নানামুখী প্রতিবন্ধকতা। যেমন অশিক্ষা ও দারিদ্যই এর মধ্যে প্রধান। আর একারণেই শিশুকে তার পরিবার ঠেলে দিচ্ছে শিশুশ্রমে। যা শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে বড় প্রতিবন্ধকতা। শিশু বঞ্চিত হচ্ছে তার শিক্ষা ও আনন্দময় শৈশব থেকে। আর সে কারণে শিশুশ্রম পরিগণিত হয় অভিশাপ হিসেবে। কারণ শিশুশ্রমের ফলে শিশু যখন বেড়ে ওঠে, সে ভোগে পুষ্টিহীনতায়, বিভিন্ন রোগে। তার মানসিক বিকাশ ভালোভাবে সম্পন্ন হয় না । ওই শিশু যখন বড় হয়, তখন সে শারীরিক মানসিক এবং শিক্ষাগতভাবে দেশের বোঝার মতো কাজ করে। শিশুশ্রম ঘটে বাবা-মার অসচেতনতার পাশাপাশি কিছু অর্থলোলুপ মানুষের কারণে। যারা মনে করে অল্প মূল্যে কাজ উদ্ধার করা গেলে নিজের মঙ্গল। এটিই হলো উন্নয়নশীল দেশের চরম বাস্তবতা। তবে শিশুশ্রম রোধে নির্দিষ্ট আইন রয়েছে। পাশাপাশি শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করতে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রও রয়েছে দায়বদ্ধ। তাই এসব কথা মাথায় রেখে যদি শিশুবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা যায তবে আমরা পাব সুখী সমৃদ্ধ এবং উন্নত রাষ্ট্র। তাই জাতির ভবিষ্যতের জন্য সরকারের পাশাপাশি সবার এগিয়ে আসা উচিত শিশুশ্রম রোধ করার জন্য।

বাংলাদেশে আর্সেনিক দূষণ

সারা বিশ্বে আর্সেনিক একটি মারাত্মক দূষণ। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। আর্সেনিক দূষণ সম্পর্কে আমরা সচেতন নই। প্রথমেই জানা দরকার আর্সেনিক কী। আর্সেনিক এক ধরনের ধাতু যা অতিরিক্ত মাত্রায় মানবদেহের জন্যে ক্ষতির কারণ হতে পারে। এর কোনো রং স্বাদ ও গন্ধ নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে বাংলাদেশের জন্য প্রতি লিটার পানিতে .০৫ মিলিগ্রামের বেশি আর্সেনিক থাকলে তা মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক পাওয়া গেছে। এক হিসাব মতে ৬১ জেলায় এই আর্সেনিক পাওয়া গেছে। একে ব্যাপক স্বাস্থ্য ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন বিশেষজ্ঞরা। আর্সেনিক রোগের দীর্ঘস্থায়ী লক্ষণগুলো হচ্ছে, রোগীর গায়ে কালো কালো দাগ, হাতে পায়ের তালু শক্ত ও খসখসে, ছোট ছোট ফুসকুড়ি, বমিভাব এবং পাতলা পায়খানা। আবার কখনো জিহ্বা ও গায়ের ওপর কালো দাগ হতে পারে। আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় সঠিক কোনো চিকিৎসা এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। ফলে বাংলাদেশে এ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কিছু পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। যেমন, গভীর নলকূপ বসাতে হবে, নদীনালার পানি জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহার করতে হবে, বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি ধরে রেখে পরে ব্যবহার করতে হবে, ভূগর্ভস্থ মাটি ও পানি পরীক্ষা করে নিরাপদ স্থানে নলকূপ বসাতে হবে। আর্সেনিক দূষিত পানি পান করা থেকে দূরে থাকতে হবে, আর্সেনিকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। এভাবে আর্সেনিক দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে।

নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য

একটি রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে ওই রাষ্ট্রের নাগরিক যে সুবিধাগুলো ভোগ করে তাই নাগরিক অধিকার। আর এই রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিক যে দায়িত্ব পালন করে তাই নাগরিক কর্তব্য। কেননা নাগরিক অধিকার ভোগের মাধ্যমে ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়। আর কর্তব্য পালনে রাষ্ট্র উপকৃত হয়। নাগরিকের অধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে চলাফেরার অধিকার, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, ধর্মচর্চার অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের অধিকার, চাকুরি করার অধিকার, পরিবার গঠনের অধিকার ইত্যাদি। আর কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আইন মেনে চলা, রাষ্ট্রের প্রতি

আনুগত্য প্রকাশ করা, ভোটাধিকারের যথাযথ প্রয়োগ করা, ট্যাক্স প্রদান করা, সরকারি কাজে সহায়তা করা, সন্তানকে যথাযথ শিক্ষা দেয়া। আর এই অধিকার ভোগ আর কর্তব্য পালনেই রাষ্ট্র হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ।

গণশিক্ষায় রেডিও-টিভি

রেডিও এবং টেলিভিশন আধুনিক সভ্যতার এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। ঘরে বসে আমরা দূরের নানা অনুষ্ঠান রেডিওর মাধ্যমে শুনতে পাই। তেমনি টেলিভিশনে সরাসরি ছবির মাধ্যমে অনুষ্ঠান দেখেতে পারি। এই দুই মাধ্যমই হয়ে ওঠে গণশিক্ষার আকর। কেননা এই দুই মাধ্যম প্রায় প্রতিটি ঘরে ঘরে রয়েছে। যা প্রতিনিয়ত আমাদের নানামুখী বিষয় সম্পর্কে ধারণা দিয়ে যাচ্ছে। রেডিওর মাধ্যমে শুধু ধ্বনি শোনা যায়, ছবি দেখা যায় না। তবুও গণশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। টেলিভিশনের মাধ্যমে আমরা সচিত্র শিক্ষামূলক কার্যক্রম দেখি ও শুনি। যেমন– বিতর্ক অনুষ্ঠান, আবৃত্তি, নাচ, গান, সাহিত্য ও কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান। এতে উপকৃত হচ্ছে সমাজের প্রতি স্তরের মানুষ। ছাত্র থেকে শুরু করে কৃষক পর্যন্ত। বলা যায় রেডিও-টেলিভিশন দূরবর্তী মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি, চিন্তার অনন্য সাধারণ বাহন এবং গণশিক্ষার আকর। তাই এর গুরুত্ব গণজীবনে অনস্বীকার্য।

গ্রাম ও শহর

ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন গ্রাম আর মানুষ সৃষ্টি করেছেন শহর। একথা ধ্রুব সত্য। গ্রাম বলতে আমরা বুঝি কৃষিভিত্তিক কাঠামোর মধ্যে গাছপালা, নদীনালা বেষ্টিত একটি অবস্থা। যেখানে মানুষ বসবাস করে সংঘবদ্ধ হয়ে। তাদের প্রধান জীবিকা মূলত কৃষি। আর শহর বলতে কোলাহলযুক্ত যান্ত্রিক যানবাহনে পরিপূর্ণ কলকারখানা ও ইট পাথরের স্তূপকৃত দালানকোঠা। এখানে শ্রমিক কাজ করে কলকারখানায় আর শিক্ষিত শ্রেণি কাজ করে অফিস আদালতে। তবে শহর ও গ্রামের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। শহর যতটা কোলাহলপূর্ণ গ্রাম ততটাই নিরিবিলি ও শান্ত। শহরের বাতাস দূষণে ভরা, কিন্তু গ্রামের বাতাস নির্মল। শহরে নাগরিক সুযোগ সুবিধা বেশি থাকলেও গ্রামের মতো এমন সহজ সরল জীবনের সন্ধান পাওয়া কঠিন। গ্রামে যেমন গ্রামীণ মেলা, জারি, সারি, বাউল গানের আসর বসে, তেমনি শহরে তা কল্পনা করা যায় না। তবে শহরে শিক্ষার সুবিধা বেশি। গ্রামে এই সুবিধা অনেকটা ক্ষীণ। তাই শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈষম্য কমিয়ে এনে শহরের মানুষকে গ্রামমুখী করতে পারলে আমরা একটি সুখী সমৃদ্ধ দেশ পাব বলে আশা করি।

নববর্ষ

আসিয়া বৈশাখ, কহে দিয়া ডাক কেন আছো ঘুম ঘোর
জ্বরা-জীর্ণতা ত্যাজিয়া আজিকে খোলোনা হৃদয় দ্বোর

কবির এ বক্তব্য নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে। বাংলা নববর্ষ আসে পুরাতন জ্বরা জীর্ণতাকে দূরীভূত করে নতুনের জয়গান গাওয়ার জন্য। নববর্ষে অর্থাৎ পহেলা বৈশাখে বৃক্ষের ডগায় যে নতুন পর্ণমোচা দেখা যায়, তা যেন সম্ভাবনার কথাই বলে। নতুন সূর্য, নতুন ভোর সবকিছু যেন নবচেতনার উৎসভূমি। আর এ বৈশাখকে কেন্দ্র করে শহর এবং গ্রামে দেখা যায় বিচিত্র মেলার আমেজ। গ্রামের মেলায় ঘোড়দৌঁড়, পুতুলনাচ, মাটির তৈজসপত্র এগুলো যেন আমাদের ঐতিহ্য বা সংস্কৃতিকে আবার নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়। শত বছর ধরে এটিকে আমরা লালন করি নিজেদের সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে পৃথিবীর বুকে তুলে ধরার প্রয়াসে। শহরে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' সমস্ত অশুভকে পেছনে ফেলারই বার্তা। আর মুক্তিযুদ্ধের আগে ষাটের দশকে জাতীয়তাবাদী চেতনার উৎস হিসাবে কাজ করেছে এই নববর্ষ। তাই নববর্ষকে আমরা পালন করব সবরকম অশুভ, জ্বরা এবং সাম্প্রদায়িকতাকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য; নতুনের জয়গান গাওয়ার প্রত্যয়ে।

ডিশ এন্টেনার প্রভাব

বর্তমান যুগ প্রযুক্তির যুগ। প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারের একটি গুরুত্ববহ অংশ ডিশ এন্টেনা। যার কল্যাণে সারা বিশ্ব আজ হাতের মুঠোয়। আর এর প্রভাব আমাদের সমাজে ব্যাপক, গভীর এবং বিস্তৃত। ডিশ এন্টেনার কল্যাণে আমরা বিশ্বের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তের খবর চোখের নিমিষে জানতে পারছি। যা পূর্বে কখনো সম্ভব ছিল না। টেলিভিশনের নানা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান আমাদের ব্যাপকভাবে বিনোদিত করে। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান মানসিক বিকাশে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার

করে আছে। বিশ্বের নানামুখী জ্ঞান আমাদের যেমন সমৃদ্ধ করছে তেমনি, আমাদের ভেতরে এই আকাশ সংস্কৃতির উম্মুক্ততা এক ধরনের বিকারগ্রস্ততা তৈরি করছে। ফলে মানুষের মধ্যে গড়ে উঠছে এক ধরনের মিশ্র সংস্কৃতি। এই বিষয়ে সচেতন না হলে আমরা আমাদের সংস্কৃতির শিকড় থেকে দূরে সরে যাব। যে কারণে আমাদের উচিত ভাল-মন্দ যাচাই বাছাই করে এর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থেকে যথাযথ উপযোগিতা ভোগ করা। তবে একটি সুষ্ঠু স্বাভাবিক সমাজ-সংস্কৃতি বিনির্মাণে ডিশ এন্টেনার প্রভাবে আমরা সমৃদ্ধ হতে পারব।

বেকার সমস্যা

বেকার সমস্যা একটি অভিশাপের মতো। সারাবিশ্বেই এই সমস্যা দৃশ্যমান। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। কারণ এখনো পর্যন্ত প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ তরুণ রয়েছে বেকার। বাংলাদেশ জনবহুল দেশ হওয়ায় এখানে এই সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। কেননা যত বেকার তত কর্মসংস্থান এই দেশে গড়ে ওঠেনি। কারণ ভারী শিল্পায়নের অভাব, কুটির শিল্পের অভাব, স্বকর্মসংস্থানের অভাব, কর্মমুখী শিক্ষার অভাব। বেকারত্বের করাল গ্রাসে যুব সমাজ আজ বিপন্ন প্রায়। পরিবার থেকে সমাজ জীবনে প্রতিনিয়ত সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়ে যুব সমাজ ঝুঁকে পড়ছে নানামুখী অপরাধের মধ্যে। ছিনতাই, ডাকাতি, মাদকাসক্তি এখন তাদের নিত্য বিষয় হয়ে উঠেছে। ফলে পরিবার থেকে রাষ্ট্রে তা একটি বোঝার মতো অবস্থা সৃষ্টি করেছে। তবে বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন সঠিক নির্দেশনা বা পরিকল্পনা। সরকার কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে; যেমন, কারিগরী শিক্ষার প্রসার, কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার, যুব প্রশিক্ষণের প্রসার ইত্যাকার বিষয়। এছাড়া বেসরকারি পর্যায়ে এবং ব্যক্তি পর্যায়ে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করলে সম্পূর্ণ বেকারত্ব দূর করা না গেলেও তা লাঘব করা সম্ভব। এর মাধ্যমে জাতি হয়ে উঠতে পারে বেকারত্বের অভিশাপ মুক্ত এবং সমৃদ্ধ।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপার লীলাভূমি। যেদিকে তাকাই শুধু প্রকৃতির রূপচ্ছটা। যা মানুষের দেহ ও মন ভরিয়ে দেবে অবলীলায়। তাই দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করবে না– এমনটা ভাবা যায় না। বর্তমান পৃথিবীতে পর্যটন শুধু একটি বিনোদনের বিষয় নয়, এটি একটি শিল্পও বটে। বাংলাদেশ তাই স্বাধীনতার পর থেকে এই শিল্পকে ঢেলে সাজানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। কারণ বাংলাদেশে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমুদ্র সৈকত, ম্যানগ্রোভ বন, পাহাড়, উপজাতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যে ভরপুর সমৃদ্ধ পর্যটন এলাকা। এগুলো মানুষকে যেমন মনের খোরাক যোগাতে পারবে তেমনি, করবে জ্ঞানে সমৃদ্ধ। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প এখানো সঠিকভাবে আলোর মুখ দেখেনি। যেখানে থাইল্যান্ড, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কার মতো দেশ আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। কারণ হিসাবে যা বলা যায় তা হল, অবকাঠামো উন্নয়নের সংকট, নিরাপত্তার অভাব, প্রচারণার অভাব, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধর্মঘট হরতাল ইত্যাকার কারণে বিদেশি ও দেশি পর্যটকরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। আর এই দুরবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকারকে ব্যাপকভাবে নানামুখী প্রকল্প হাতে নিতে হবে, যাতে পর্যটন শিল্পে বাংলাদেশ রোল মডেল হতে পারে।

এইডস

এইডস একটি মরণব্যাধি। এইচআইভি ভাইরাস থেকে এ রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রথম আমেরিকায় ১৯৮১ সালে এই রোগটি ধরা পড়ে। এই রোগ একবার মানুষের মধ্যে বাসা বাধলে তার মৃত্যু অনিবার্য। তাই বিশ্বব্যাপী এই রোগের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে ১ ডিসেম্বর পালিত হয় বিশ্ব এইডস দিবস। এই রোগটি দক্ষিণ এশিয়াতেও এখন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ায় বাংলাদেশও এ ঝুঁকির বাইরে নয়। তবে জানা প্রয়োজন কিভাবে মানুষ এইডস রোগে আক্রান্ত হয়– ক) অবাধ যৌন মিলনের ফলে, খ) রক্তের মাধ্যমে, গ) এইডস রোগে আক্রান্ত রোগীর ব্যবহৃত সূঁচ, সিরিঞ্জ ও অস্ত্রপোচারের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে, ঘ) এইডস আক্রান্ত গর্ভবতীর সন্তান এই রোগে আক্রান্ত হয়। এই রোগের কিছু লক্ষণ রয়েছে। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ওজন কমে যায়, বমি বমি ভাব হয়, শরীর ব্যথা করে , স্মৃতিশক্তি লোভ পায়, ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হয়। এইভাবে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমাগত কমতে থাকে। একদিন মৃত্যুর কোলে ঢুলে পড়ে। তবে এ রোগের কোনো চিকিৎসা না থাকায়, তা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় সচেতনতা। যেমন– অরক্ষিতভাবে যৌন মিলন না করা, রক্ত দেওয়া বা নেওয়ার সময় নতুন সিরিঞ্জ, সূঁচ ব্যবহার করা, সন্দেহজনক ব্যক্তির রক্ত পরীক্ষা করা

এবং ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা। এসবের মধ্য দিয়ে এ রোগের পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব। এজন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায় থেকে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরি।

শখ

মানুষ মাত্রই বিনোদনমুখী। কারণ জীবনের নানা জটিলতার মধ্যে মানুষ খুঁজে পেতে চায় নিজের সত্তাকে। আর শখ হল তার অন্যতম মাধ্যম। মানুষের নানা রকম শখ থাকে। যেমন– মাছ ধরা, রান্না করা, ফুলের বাগান করা, গান গাওয়া, খেলাধুলা করা, পাখি পালন করা, ভ্রমণ করা, লেখালেখি করা ইত্যাদি। শখ পুরণের মাধ্যমে মানুষ তার সুকুমার বৃত্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারে। যদি কেউ কবিতা, গান, প্রবন্ধ, নাটক লিখে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়, তবে মানুষও তা পড়ে আনন্দিত হতে পারে। ফলে আনন্দের ধারা সবখানে প্রবাহিত হতে থাকে। ভালো শখ পালনের মধ্য দিয়ে সব অশুভ হতে পারে দূরীভুত। কারণ মানুষ যখন অবসর থাকে তখন তার মধ্যে নানামুখী চিন্তা ভর করে। যদি সে তার ভালো শখগুলো পূরণ করতে পারে তবে, তার মধ্যে কোনো অশুভ চিন্তা ভর করতে পারবে না। তাই প্রতিটি মানুষের উচিত কর্মব্যস্ততার ফাঁকে শখের পরিচর্যা করা, যাতে সে নিজেকে নিজের মধ্যে ফিরে পেতে পারে।

যৌতুক প্রথা ও নারী নির্যাতন

সাধারণভাবে নারীদের সমাজের দুর্বল অংশের মধ্যে একটি অংশ বলে মনে করা হয়। কারণ তথাকথিত পুরুষ শাসিত সমাজে নারী একটি দুর্বল প্রত্যয়। সেই নারীকে নির্যাতনের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে ধরা হয়েছে যৌতুক প্রথা নামক এক ভয়াবহ প্রথাকে। যৌতুক প্রথা বহু আগে থেকেই সমাজে বিদ্যমান। কিন্তু আধুনিক সমাজেও তা অহরহ দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে গরিব পিতা-মাতার কাছ থেকে মোটা অংকের যৌতুক নিচ্ছে সমাজের এক শ্রেণির মানুষ। যৌতুক না দিতে পারার দায়ে নারীকে হতে হচ্ছে অগ্নিদগ্ধ; কখনো কখনো এসিড সন্ত্রাসের মতো ভয়াবহ সন্ত্রাসের শিকারও হতে হচ্ছে। এমন কি মৃত্যুর মতো ভয়াবহ পরিণতি বরণ করতে হয় নারীকে। ফলে ঐ নারীর পরিবার হচ্ছে নিঃস্ব এবং সহায় সম্বলহীন। এর পিছনে প্রধান কারণ হিসাবে সমাজবিজ্ঞানীরা অশিক্ষা, দারিদ্র্য, কুসংস্কার এবং অসচেনতাকেই দায়ী করেন। যৌতুক প্রথা আর নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য রয়েছে আইন। আইনের আশ্রয় লাভ করার মাধ্যমে নারী এ ধরনের ভয়াবহ প্রথার কবল থেকে রক্ষা পেতে পারে। এ ধরনের কুপ্রথা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আইনের পাশাপাশি প্রয়োজন গণসচেতনতামূলক সামাজিক আন্দোলন, শিক্ষার প্রসার এবং দারিদ্র্য বিমোচন। তাহলেই নারীকে আমরা দিতে পারব যথাযথ মর্যাদা বা সম্মান।

যুব সমাজের অবক্ষয়

যুব সমাজ একটি জাতি গঠনের অন্যতম নিয়ামক হিসাবে কাজ করে । যৌবন, তারুণ্য এগুলো মানুষের প্রধান সম্পদ। এসময়ই তারা পারে সমাজকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখাতে। কিন্তু সেই যুবসমাজ যখন নিজেদের সম্ভাবনাকে ধূলিসাৎ করে নষ্টদের দলে যোগ দেয়, তখনই জাতির জীবনে নেমে আসে অমানিশার ঘোর অন্ধকার । যুব সমাজের মধ্যে যখন নানা রকম হতাশা ঢুকে পড়ে, তখন তারা নানামুখী অবক্ষয়ের দিকে পা বাড়ায়। যেমন– নেশা করা, ছিনতাই করা, রাহাজানি করা, এসিড নিক্ষেপ করা এবং নারী নির্যাতনের মতো ভয়াবহ খারাপ কাজে তারা লিপ্ত হয়। ফলে জাতি হারিয়ে ফেলে তার দিশা। এর কারণ হিসাবে সমাজ বিশ্লেষকরা মনে করেন দারিদ্র, কর্মসংস্থানের অভাব, বেকারত্ব অশিক্ষা, অপ-আদর্শ, আকাশ সংস্কৃতি, ইত্যাকার বিষয় তাদের অবক্ষয়ের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। তবে তাদের অবক্ষয় থেকে বাঁচানোর উপায় হিসাবে পরিবারকেই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। কারণ পরিবারই হলো ছোটবেলা থেকে নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার অন্যতম প্রতিষ্ঠান। এছাড়া তাদের সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক আবহের মধ্যে বেড়ে উঠতে দিতে হবে, ভালো ভালো বই পড়তে হবে। জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে এ ধরনের অবক্ষয় থেকে বাঁচা সম্ভব। তাই সমাজের প্রতিটি স্তরে সচেতনতা বাড়ালে এ ধরনের মারাত্মক অবক্ষয় থেকে সমাজকে বাঁচানো সম্ভব।

	সাহায্য বা সহায়তার জন্য পরামর্শ নিন–আপনার স্টাডি সেন্টারের কোর্স টিউটর	**ড. মো. চেঙ্গীশ খান** সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা), ওপেন স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫। ইমেইল: chenggish@gmail.com এবং **মেহেরীন মুনজারীন রত্না** সহকারী অধ্যাপক (বাংলা), ওপেন স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫। ইমেইল: meherin2010.bou@gmail.com